আমার বিচিত্র শিল্পজগতের চৌহদ্দি

দেবাশীষ দেব

হাস্যরস থেকে কার্টুন

মানুষের জীবনে হাস্যরসের একটা বিশেষ গুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কারণ যা কিছু আমাদের হাসির খোরাক জোগায় তার একটা অনুকূল প্রভাব সরাসরি আমাদের শরীর আর মনের ওপর গিয়ে পড়ে। সারা পৃথিবীতে এই তত্ত্ব আজ বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত। ইংরাজিতে একটা কথাই আছে 'Laughter is the best medicine'। তাই দেখা যায় হাস্যরসকে অবলম্বন করে যা কিছু সৃষ্টি

হয়েছে তা সবই সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের এক বিকল্পহীন উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এর অজস্র নমুনা আমরা চলচ্চিত্র, সাহিত্য অথবা চিত্রকলার মধ্যে পেয়ে থাকি।

ছবি এঁকে মানুষকে হাসানোর চেষ্টা প্রথম শু হয় আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে ইটালি ও ইংলন্ডে। তবে সে সব হাসির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন নানা সামাজিক অসঙ্গতি ও ধর্মীয় অনুশাসনের বিদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা অতএব একসঙ্গে বহু সংখ্যক লোকের যাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় সেই কথা ভেবে শিল্পীরা ছবিগুলো আঁকলেন কিছুটা সরস ভঙ্গিতে - ফুটে উঠল একটা ব্যঙ্গাত্মক মেজাজ। সবাই দেখল, মজা পেল আর সেই সঙ্গে তৈরি হল সমাজসচেতনতা। শিল্পীর উদ্দেশ্য ষোল আনা সফল হল।

এই ভাবে একে একে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও একই ধরণের ছবি আঁকার তাগিদ অনুভব করলেন শিল্পীরা, যার ফলে তৈরি হল শিল্পের এক আনকোরা নতুন আঙ্গিক যার প্রধান শর্ত হল ছবির মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টি করে কোনও একটা বিষয়ে জোরালো বত্তব্যকে তুলে ধরা। এই সব ছবির নাম দেওয়া হল 'কার্টুন'।

কার্টুন ও ক্যারিকেচার

কার্টুন আঁকতে হলে একজন শিল্পীর থাকা চাই সূক্ষ্ম রসবোধ, চারপাশের সব কিছু সম্পর্কে একটা সজাগভাব, তির্যক দৃষ্টি-ভঙ্গি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা। যেমন ধরা যাক অমল চত্রবর্তীর করা কার্টুনটির কথা। একটি ছোট ছেলে ইউনিফর্ম পরে পিঠে বিরাট এক বই খাতার বোঝা নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। ছেলেটির পাশে লেখা K.G.1 আর বই খাতার পাশে লেখা K.G.20 অর্থাৎ K.G 1এ পড়া

ওইটুকু ছেলের ঘাড়ে কি বিরাট লেখাপড়ার বোঝা। আমাদের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কত অল্পে কি সাংঘাতিক উপহাস। খাঁটি কার্টুনের নমুনা।

কার্টুনিস্টরা সাধারণত তাঁদের বত্তব্যকে পরিবেশন করেন মজাদার একটা ছবি এঁকে - কিন্তু কীভাবে তাঁদের ছবি মজাদার হয়ে ওঠে একটা উদাহরণ দিয়ে সেটা দেখা যাক -

আমাদের সামনে পরপর একই লোকের দুটো ছবি রয়েছে - ছবি (১) আর ছবি (২)

ছবি (১)-এ মানুষটির চোখ, নাক, ঠোঁটের মধ্যে কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। যেমন....

(১) চোখটা বড় করে খোলা

(২) ভুটা ওঠানো
(৩) ঠোঁটের দুধার কিছুটা ওপরে তোলা।
(৪) সারা মুখে একটা অবাক হওয়া ভাব।
এবার আসি ছবি (২)-এ
একই মুখের সেই স্বাভাবিক চোখ,নাক, ঠোঁটকে অস্বাভাবিক করে দেওয়া হয়েছে একটা অতিরঞ্জিত চিত্রায়ণের সাহায্যে। যেমন ঃ
(১) চোখ আরও বড় করে খোলা।
(২) ভু আরও ওঠানো।
(৩) ঠোঁটের দুধার আরও তুলে দেওয়া হয়েছে
(৪) পুরো মুখে আরও অবাক হওয়ার ভাব।
(৫) নাকটাকেও আঁকা হয়েছে মুখের অস্বাভাবিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তবে মূল চেহারাকে অক্ষত রেখেই।
(৬) চারপাশের ছোট ছোট লাইনকে ব্যবহার করা হয়েছে একটা effect বা চলমানতা আনার জন্য।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কার্টুনে মানুষের চেহারাকে হাস্যকর বানানো যায় তার স্বাভাবিক চেহারাকে অস্বাভাবিক করে তুলে। এর জন্য তার যাবতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেমন মুখের অভিব্যক্তি, মাথার চুল, পোশাক-আষাক সব কিছুকে যতটা সম্ভব অতিরঞ্জিত করে দেখাতে হয়(মূল চেহারাটা নষ্ট না করেই)
একেবারেই গোড়া থেকেই শিল্পীরা বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে এসেছেন তাঁদের কার্টুনে-দোষে-গুণে ভরা সেই সব মানুষদের বিশেষ দিকগুলো বেশী করে ফুটিয়ে তোলার জন্য নানাভাবে তাঁদের চেহারা বিকৃত করেছেন - সাধারণ মানুষ এইসব তামাসা খুবই উপভোগ করেছেন এবং দেখা গেছে ধীরে ধীরে একটা স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম গড়ে উঠেছে যার নাম 'ক্যারিকেচার'। ইটালিয়ান শিল্পী এ্যানাবেল ক্যারাচ্চি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রথম এই ধরণের ছবি আঁকতে শু করেন - ক্যারিকেচার শব্দটিও এসেছে তাঁর নাম থেকেই।
উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় ফরাসি শিল্পী শার্ল ফিলিপঁ তৃতীয় নেপোলিয়নের একটা ক্যারিকেচার করেছিলেন যাতে দেখানো হয়েছিল গোলগোল চেহারার এই অপদার্থ দেশশাসক কী ভাবে ধীরে ধীরে একটা ন্যাসপাতিতে (পিয়ার) পরিবর্তিত হল। শিল্পী ইচ্ছে করেই ন্যাসপাতি এঁকেছিলেন কারণ পিয়ার শব্দটির গ্রাম্য অর্থ মাথামোটা। এ নিয়ে যথেষ্ট জলঘোলা হয়েছিল এবং শেষমেশ ফিলিপঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এই ধরণের ক্যারিকেচার পরবর্তীকালে বহু শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করেছে।
যেমন একটা ক্যারিকেচার আমরা দেখি প্রাক্তন বিট্রিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের মুখ ধীরে ধীরে একটি ঝুঁটিওলা মোরগ হয়ে গেল অথবা অন্য একটাতে খোমেইনি বদলে গিয়ে হয়ে গেলেন একটা শকুন। সৌভাগ্যবশত ফিলিপঁর মতো এই সব শিল্পীদের জেল খাটতে হয়নি।
কমিক ইলাস্ট্রেশন

পৃথিবীতে কার্টুন আঁকা শু হয় ছাপার যন্ত্র আবিষ্কারেরও আগে থেকে। তখনকার দিনে শিল্পীরা কার্টুন অথবা ক্যারি- কেচার বড় বড় পোষ্টারের মতো করে কখনও এঁকে কখনও এনগ্রেভিং অথবা এচিং পদ্ধতিতে একাধিক কপি বানিয়ে কোনো প্রকাশ্য স্থানে রেখে দিতেন।
পরবর্তীকালে ছাপার যন্ত্র আবিষ্কার এবং ছাপার বিভিন্ন পদ্ধতির যতই অগ্রগতি হতে লাগল কার্টুনিস্টরা তাদের ছবি খুব সহজেই বেশী সংখ্যক লোকের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হলেন। এক কথায় বলা যায় যে কার্টুন শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির পিছনে মুদ্রণ মাধ্যমের এক অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে কার্টুন আর ক্যারিকেচারের চাহিদা যতই বাড়তে লাগল ততই বেশী করে শিল্পীরা দলে দলে কার্টুন চর্চায় মেতে উঠলেন। প্রত্যেকের কাজের মধ্যে নিজস্ব একটা প্রকাশভঙ্গির ছাপ পাওয়া গেল। —সেই সঙ্গে সৃষ্টি হতে লাগল রকমারি সব মজার মজার আঁকার ধরণ।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই ইউরোপ ও আমেরিকায় সাময়িক পত্রপত্রিকার যুগ শু হয়ে গেল । তারপর বের হতে শু করল দৈনিক খবরের কাগজ — ছাপা হতে লাগল বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বইপত্র। প্রকাশক ও সম্পাদকরাও উঠে পড়ে লাগলেন পাঠকদের কাছে এগুলোকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য।

খবরের কাগজে বা পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে নানা ধরণের কার্টুন তো ছাপা মজার ছবি। প্রধানত ছোটদের বইতেই এ ধরণের ছবি ছাপা হত সব থেকে বেশী। কারণ ছোটরা পছন্দ করে মূলত ছবির ভিতর দিয়েই গল্পটা বুঝতে। এমনকি বিজ্ঞাপনদাতারাও ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নানা ধরণের কৌতূহলপ্রদ ছবিকেই হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিলেন তাদের পণ্যসামগ্রী বিক্রি করার জন্য। কাজেই দেখা গেল ব্যঙ্গধর্মী ছবির এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বহু শিল্পী শুধু কার্টুনেই সীমাবদ্ধ না থেকে ভিন্নতর ক্ষেত্রেও তাঁদের আঁকার ধরণটিকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে লাগলেন। এই ধরণের ছবিকেই বল হল ইলাস্ট্রেশন যা ধীরে ধীরে কার্টুনের সঙ্গে সমানভাবে সমৃদ্ধ হয়ে এক নতুন ধারার শিল্প হয়ে উঠতে লাগল, আর শিল্পীরাও তাঁদের স্বকীয় কল্পনাশক্তি ও প্রকাশভঙ্গির সাহায্যে এক একটি আশর্চ্য বর্ণময় জগৎ তৈরি করে বিস্ময় ও মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকা পাঠকদের তার মধ্যে চিরকালের জন্য বন্দী করে ফেললেন। ঠিক যেমনভাবে সুকুমার রায়ের আঁকা আবোল তাবোলের ইলাস্ট্রেশনগুলো প্রতিটি বাঙালি পাঠকের অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে।

ছোটবেলার দেখা কিছু কমিক ছবি

ছোটবেলায় আরও পাঁচটা ছেলের মতো আমিও বইপত্রে কার্টুন বা কমিক ইলাস্ট্রেশন থাকলে সেগুলোই বেশী উপভোগ করতাম, সেই সঙ্গে এই ধরণের ছবির প্রতি একটা আলাদা উৎসাহ তৈরি হচ্ছে সেটাও বুঝতে অসুবিধে হত না। ওই বয়সে আমার সবচেয়ে প্রিয় শিল্পী ছিলেন সুকুমার রায় আর শৈল চক্রবর্তী। আবোল তাবোলের এক একটি চরিত্র, এক একটি সিচুয়েসন কি অসম্ভব মজাদার— কাতুকুতু বুড়োর হাতে পালক নিয়ে ওই ঝুঁকে পড়া চেহারা, কিংবা হুঁকোমুখো হ্যাংলা বা কু মড়ো পটাশের ওই অদ্ভুত মুখভঙ্গি। আসলে হাসির ছবির মূল ব্যাপারটাই তো হল অভিব্যক্তি — যেমন শৈল চক্রবর্তীর ছবিতে ঢুলু ঢুলু চোখের বহু পরিচিত শিব্রাম চক্রবর্তী। মুখের একপাশে চুলের কিছুটা ঝুলে রয়েছে — ধুতি পাঞ্জাবী পরা ফিটফাট বাবুটি — ভোলা যায় না। অর্থাৎ মানুষের মুখের মধ্যে, হাবভাবের মধ্যে একটা কমিক উপাদান না আনতে পারলে যথার্থ হিউমারের সৃষ্টি হয় না। আর শুধু মানুষই বা কেন, দেখা গিয়েছে পশু-পাখি, সাপ-খোপ, পোকা-মাকড়। হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পীরা এঁদেরও বাদ দেননি। এদের কান্ডকারখানা নিয়েও যে কী মজার মজার দৃশ্য তৈরী করা যায় তা দেখিয়েছেন ওয়াল্ট ডিজনি। যদিও এখনকার মতো এত সহজলভ্য ছিল না তবু ছোটবেলায় সিনেমা হলে গিয়ে ডিজ্নীর বানানো বেশ কিছু কার্টুন ফিল্ম আমি দেখেছি। TOM & JERRY, DONALD DUCK অথবা MICKEY MOUSE -এর নাম তখনকার দিনেও ছোটদের মুখে মুখে ফিরত।

ইঁদুর, বেড়াল, বাঘ, হাতি, কুকুর সবাই মানুষেরই মতো জামা-প্যান্ট পরে হাত পা তুলে নাচছে। বন্দুক ছুঁড়ছে, মুখ নাড়িয়ে কথা বলছে কিংবা গিটার বাজিয়ে গান করছে। — এই সব উদ্ভট ছবি আঁকতে গেলে যে কী পরিমাণ কল্পনাশক্তি, রসবোধ আর ড্রয়িং-এর দক্ষতা দরকার তা ভাবা যায় না। আসলে বাস্তবজীবনে যা কিছু অসম্ভব তা একমাত্র শিল্পীরাই পারেন ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে আর তাই বারবার তাঁরা জীবজন্তুকেই বেছে নিয়েছেন absurd পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য, কারণ মানুষের তুলনায় মনুষ্যেতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এ ব্যপারে অনেক বেশী সুযোগ নেওয়া যায়। বাঘের ডোরা, বেড়ালের গোঁফ, ইঁদুরের ল্যাজ কিংবা হাতির শুঁড় — মজার ছবি আঁকতে এগুলো শিল্পীদের খুবই সাহায্য করে। মনে পড়ে যাচ্ছে উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা সেই বাঘ বরকে। — কোঁচানো ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, মাথায় টোপর এদিকে পাঞ্জাবীর ফাঁক দিয়ে লম্বা ল্যাজটা বেরিয়ে রয়েছে —এই অদ্ভুত খেয়াল রসের ছবি কোনও মানুষকে নিয়ে আঁকা সম্ভব হত না।

ছোটবেলা থেকেই SPAN আর সোভিয়েত দেশ-য়ের মতো। বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কার্টুনগুলো নিয়মিত দেখতাম আর দাণ উপভোগ করতাম। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনাকে নিয়ে নির্ভেজাল মজা করাই ছিল এই সব কার্টুনের উদ্দেশ্য। এদের বলে সামাজিক কার্টুন। বেশীর ভাগ কার্টুনের বিষয়বস্তু হত এতই সার্বজনীন যে হিউমারটা বুঝতে কোনই অসুবিধে হত না। আবার খবরের কাগজের একেবারে প্রথম পাতায় বড় বড় করে থাকত দেশ বিদেশের র

াজনৈতিক নানা ঘটনাকে নিয়ে করা কার্টু ন। সেই সময় বাঙালি পাঠকদের কাছে সব থেকে প্রিয় কার্টুনিস্ট ছিলেন 'কুট্টি'। ওই বয়সে রাজনীতি বুঝতাম না তবে এই মালয়ালি শিল্পীর আঁকা বেশ ভালো লাগত। মোটা ফেল্ট পেন দিয়ে জোরালো আঁচড়ে কখনও ইন্দিরা গান্ধী, কখনও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আবার কখনও জ্যোতি বসুকে নিয়ে কার্টুন আঁকতেন। ওঁর ক্যা রিকেচারের হাত ছিল চমৎকার— মনে আছে উনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন জ্যোতিবাবুর কপাল থেকে নিয়ে পুরো মাথার সামনেটা একটু বেশী বাড়িয়ে দিলেই ওঁর মুখটা কি দাণ কমিকাল হয়ে যায়। পরে দেখেছি জ্যোতিবাবুকে আঁকার সময় অনেক শিল্পীই এই কায়দাটাকে কাজে লাগিয়েছেন।
বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর শেখ মুজিবর রহমান যখন প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসলেন তখন কুট্টি তাঁর একটা ক্যারিকেচার করেছিলেন। ছবিতে ছিল মুখে পাইপ নিয়ে কালো জহর কোট পরা মুজিব মাথায় বিশাল একটা কাঁটার মুকুট —এর কিছুদিন পরেই মুজিবকে সপরিবারে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিতে হয়। কার্টুনিস্টরা এইরকমই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হয়ে থ াকেন। শুনেছি ইংল্যান্ডের কিংবদন্তী শিল্পী ডেভিড লো এতটাই ভালো রাজনীতিবিশেষজ্ঞ ছিলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চার্চিল পর্যন্ত নিয়মিত তাঁর পরামর্শ নিতেন।

খবরের কাগজের প্রথম পাতায় এই ধরণের রাজনৈতিক কার্টুনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন কোনও একটা বিশেষ জায়গায় ছে াট করে আরও একটি কার্টুন ছাপানোর রেওয়াজ ছিল এবং বহু কাগজে এখনও আছে। ছোট মাপের জন্যে একে বলা হয় বক্স কার্টুন বা পকেট কার্টু ন । একেবারে ঘরোয়া কোনও টাটকা ঘটনা নিয়ে মজা করা হত এইসব কার্টুনে। একসময় চন্ডী লাহিড়ী ও অমল চক্রবর্তী আলাদা কাগজে দীর্ঘদিন ধরে একটানা পকেট কার্টুন এঁকেছেন এটা মনে আছে।

চোর-মস্তান-পুলিশ অথবা কেরানি গোছের লোক দাণ আঁকতেন চন্ডীদা - বিশেষ করে মস্তান হলেই তার পোষাক হবে চ াপা প্যান্ট, স জুতো আর গায়ে ডোরাকাটা টাইট গেঞ্জি। এই ব্যাপারটা আমার ছোটবেলা থেকেই খুব মনে ধরেছিল ত াই এখনও ওই রকম কোনও চরিত্র আঁকতে গেলেই তার গায়ে এইরকম পোষাক না দিয়ে পারিনা।

আমার ছবি আঁকার শু

আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হয়ে বিজ্ঞাপনের জগতে ডিজাইনার হিসেবে কাজ করব বলে। ইল াস্ট্রেশন বা কার্টুন করার কথা একেবারেই ভাবিনি। শিক্ষানবিশি পর্যায়ে হাতে কলমে অনেক কিছু করতে হত তার মধ্যে সব থেকে আনন্দ পেতাম স্কেচ করতে। আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে কলেজের পর বা ছুটির দিনে হাটে মাঠে গিয়ে বসে পড়তাম - ঘর-বাড়ি, মানুষজন, গাছপালা, দোকানপাট সবই হয়ে উঠত আমার ছবির বিষয়। প্রথমদিকে পেন্সিলে আঁকতাম পরে শু করলাম কালি কলমের ব্যবহার। বরাবরই একটু বেশী নজর দিতাম খুঁটিনাটির দিকে। বিষয় নির্বাচনও করতাম প্রধানত কোন জনবহুল ঘিঞ্জি জায়গা যাতে আঁকার মতো অনেক কিছু পাওয়া যায়। এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্কেচ করার প্রবণতা আম ার মধ্যে প্রথম এসেছিল মারিও মিরান্দার ইলাস্ট্রেশন দেখে। একটা পরিবেশকে ছোট ছোট ডিটেলিং-এর সাহায্যে কতটা প্রাণবন্ত করে তোলা যায় তা এই গোয়ানিজ শিল্পীর কাছে শিখেছিলাম। কোথায় কোন চরিত্রের কী কী ত্রিয়াকলাপ থ াকতে পারে-মুখভঙ্গি কী ধরণের হওয়া উচিত এমনকি তার সঙ্গে পায়ের জুতো থেকে নিয়ে মাথার টুপিটা পর্যন্ত যাতে মান ানসই হয় সব দিক নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন মারিও। এমনকি কোটের পকেট থেকে বেরিয়ে থাকা ম্যাগাজিনটা পর্যন্ত সাহায্য করত লোকটাকে ঠিকভাবে চিনিয়ে দিতে।

মারিওর পাশাপাশি আরও একজন ইলাস্ট্রেটর ছিলেন যিনি আমার ড্রয়িংকে খুবই প্রভাবিত করেছিলেন - সুধীর মৈত্র। শুধুমাত্র অল্প কয়েকটা স বাইরের রেখা দিয়ে যে কোনও জিনিষকে নিখুঁতভাবে এঁকে ফেলতে পারেন, ড্রয়িংয়ের হাত ত াঁর এতই বলিষ্ঠ। বিভিন্ন বয়সের কয়েকজন মানুষ রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছে পাশে গাছের গোড়ায় সাইকেল রাখা। পিছনের চায়ের দোকানে মোটামত এক মহিলা কোমরে আঁচল গুঁজে চা ঢালছে - মুখে একটা হাসি হাসি

ভাব - চায়ের দোকানে ঝোলানো তারের ঝুড়িতে ডিম রয়েছে। একটা ডাবওলা কাঁধে বাঁক নিয়ে চলেছে - পিছন থেকে দেখা তার খালি গা মাথায় গামছা বাঁধা - দূরে মাঠ আর তালগাছের সারি - চমৎকার একটা কম্পোজিশন। এই ধরনের ছবি তিনি পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে প্রচুর এঁকেছেন - স লাইন দিয়ে সব কিছু এঁকে নিয়ে হয়ত একটা দুটো জায়গায় কালো রং ভরে দিতেন। এই পদ্ধতিটা আমি আমার কলেজের জীবনে স্কেচে প্রচুর ব্যবহার করার চেষ্টা করতাম।

সেই সময় বিদেশি আরও একজন শিল্পীর কাজে ওই detailing দেখেছি - তিনি হলেন ডব্লু হিথ রবিনসন। মূলত কার্টুনিস্ট ছিলেন এই মার্কিন শিল্পী। তবে তাঁর ছবিতে যেমন প্রচুর মজা থাকত তেমনি থাকত ছুটি কাটাতে আসা মানুষের ভীড়ে ভর া সমুদ্রতট কিংবা ব্যস্তসমস্ত রেল স্টেশনের মতো জমজমাট পরিবেশ এবং আগাগোড়া একটা কমিক মেজাজের সঙ্গে এমন কাব্যময়তা সৃষ্টি করতেন ছবিতে তা অবাক করার মতো। লোকজন-রাস্তাঘাট- এমনকি দূরের গাছের সারি কিংবা আক াশের এক কোণে মেঘের ঘনঘটা সবই যেন এক সমন্বয়ের ছন্দে বাঁধা। সত্যজিৎ রায়ের ভীষণ প্রিয় শিল্পী ছিলেন এই হিথ রবিনসন। এঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ সেই 'রেলগাড়ীর আদিপর্ব' বলে কার্টুন সিরিজটা পর পর সন্দেশ পত্রিকাতে ছাপার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি -সঙ্গের ছোট ছোট ছড়াগুলোও মূল ইংরাজি থেকে আমাদের দেশীয় কায়দায় অসম্ভব ভালো অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। ইলাস্ট্রেশন যারা শিখতে চায় হিথ রবিনসনের কাজগুলো তাদের অবশ্যই ভালো ভাবে দেখা উচিত বলে মনে করি।

তবে সম্ভবত সব থেকে বিস্মিত হয়েছিলাম যখন 'টিনটিন' কমিক্স হাতে এল। বেলজিয়াম শিল্পী জর্জ রেমির তৈরি আগ াগোড়া রঙীন এই কমিক্স সিরিজটা আমার কাছে প্রায় বাইবেলের মতো। রেমি তাঁর গল্পের নায়ক টিনটিন ও তার দলবলকে নিয়ে একের পর এক নানা দুঃসাহসিক অভিযানে ছুটে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। পটভূমি করেছেন কখনও তিববতের বরফ ঢাকা পাহাড়, মিশরের মভূমি আবার কখনও আমাজনের গভীর অরণ্য। কমিক্স মানেই হল ছবির পর ছবি এঁকে একটা গল্প বলা আর রেমির আঁকা প্রতিটি ছবিই visual documentation হিসেবে এতই নিখুঁত আর জীবন্ত যে টিনটিনের সঙ্গে পাঠকরাও গিয়ে উপস্থিত হয় সেসব জায়গায়। রেমির গল্পে ক্য াপ্টেন হ্যাডক, প্রফেসর ক্যালকুলাস, কিংবা থমসন আর থম্পসনের মতো দান আর্কষণীয় সব চরিত্র ভীড় করে থাকে - টিনটিনের সর্বক্ষণের সঙ্গী সেই ছোট্ট সাদা কুকুর 'স্নোয়ি' পর্যন্ত নানা মজার কান্ড ঘটায়। একবার ভুল করে হুইস্কি খেয়ে নিয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে যায় তো অন্যদিকে নদীতে পড়ে হাবুডুবু খায় আবার কখনও প্রকান্ড গেরিলা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। টিনটিন কমিক্সে দেখি মভূমির উট, পের ভাল্লুক অথবা হিমালয়ের ইয়েতি পর্যন্ত মূল গল্পে কতখানি গুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। শুনেছি রীতিমত বিশাল একটা গবেষকের দল নিয়ে কাজ করতেন রেমি। তাই ছবি দেখে প াঠকের বুঝতে অসুবিধে হয় না আমাজন আর মধ্য আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে কী কী পার্থক্য অথবা ব্রিটিশ গ্রামাঞ্চলের একটা রাস্তা কতটা নির্জন আর উত্তর ভারতের একটা তস্য গলিও কতটা জনাকীর্ণ।

শৈল চত্রবর্তী থেকে জর্জ রেমি এদের সবার সম্মিলিত প্রভাব নিশ্চয়ই আমার সৃষ্টি - ধর্মিতার ওপর গভীর ছাপ ফেলেছিল কারণ স্কেচ করার পাশাপাশি কিছুটা অন্যমনস্কভাবেই মন থেকে ড্রয়িং করতে শু করে দিলাম। নানারক ম ছবিতে ভর্তি হয়ে গেল দু-তিনটে খাতাও। রসিকজনেরা সেসব দেখে মতামত দিলেন ইলাস্ট্রেশন হিসেবে মন্দ হচ্ছে না, তবে মজার স্ট াইলগুলোই জমছে বেশী। ততদিনে আমি জেনে গেছি ইলাস্ট্রেশন জিনিষটাও হচ্ছে এক ধরনের কমার্শিয়াল আর্ট সুতরাং নিয়মিতভাবে তার চর্চা শু হয়ে গেল। এব্যাপারে প্রাথমিকভাবে সিনিয়র শিল্পীদের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি বলে মনে পড়ে না বরং উৎসাহী কিছু সহপাঠী ছিল যাদের সঙ্গে আলাপ - আলোচনা চালিয়ে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি।

গোড়া থেকেই ঠিক করেছিলাম একেবারে বিশুদ্ধ কার্টুনিস্ট না হতে পারি, কমিক ইলাস্ট্রেটর হলেই বা মন্দ কী, কারণ

অনেক প্রতিষ্ঠিত কার্টুনিস্টদেরও তো বই বা পত্র-পত্রিকাতে শুধুমাত্র একজন ইলাস্ট্রেটরের ভূমিকা পালন করতে দেখেছি - বিদেশেও শিল্পীদের মধ্যে ও ব্যাপারে কোনওরকম ছুৎমার্গ চোখে পড়েনি - রোনাল্ড সার্ল বা হিথ রবিনসন এর সতো দিক্‌পাল কার্টুনিস্টরা দেখেছি ছোটদের বইয়ে নিয়মিত ছবি এঁকেছেন এমনকি লুই ক্যারলের লেখা 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ড ারল্যান্ডের ' সঙ্গে মূল ইলাস্ট্রেশন গুলো করেছিলেন কার্টুন জগতের সেই কিংবদন্তী পুষ স্যার জন টেনিয়েল। জানিনা ত াঁর করা কতগুলো কার্টুনের কথা আজ লোকে মনে রেখেছে তবে অ্যালিসের ছবিগুলি এক কালজয়ী কাজ হিসেবে অমর হয়ে আছে।

ভারতীয় কার্টুনিস্টদের মধ্যে মারিও মিরান্দা বা আর.কে.লক্ষ্মণ এর মতো সফলতম দুজন শিল্পীই ইলাস্ট্রেটর হিসেবেও ন ানাবিধ ক্ষেত্রে নিজেদের শিল্পী প্রতিভাকে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। এঁদের কমিক ড্রয়িংয়ের ধরণটা এতই অ াকর্ষণীয় আর মৌলিক যে স্রেফ ড্রয়িং হিসেবেও সাধারণ মানুষের কাছে এগুলোর একটা বিশেষ চাহিদা তৈরি হয়েছে - ত াই পোস্টার, গল্পের বই , বিজ্ঞাপন, সিনেমার টাইটেল অথবা ক্যালেন্ডার সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে এঁদের আঁকা । সুতরাং মূলত এদের দুজনের কাজের ধারাকে সামনে রেখেই নিজেকে ধীরে ধীরে তৈরি করতে লাগলাম।

ইলাস্ট্রেটর হিসেবে কর্মজগতে প্রবেশ

আর্ট কলেজের ফাইনাল ইয়ারে উঠে কিছু কিছু পত্র-পত্রিকাতে ইলাস্ট্রেশন করার সুযোগ পেলাম এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবিষ্কার করলাম সিরিয়াস ধরণের ছবি আঁকার মানসিকতা আমার একদম নেই - যে চরিত্রকেই আঁকি না কেন তাকে যদি একটু কমিক্যাল করে দেখাতে না পারি তবে মজা কোথায়? দেখলাম ছোটদের লেখায় ছবি আঁকার সুযোগ ও তৃপ্তি অনেক বেশি। ডাক পেলাম ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশ' এর জন্য ইলাস্ট্রেশন করার, যার সম্পাদক হলেন সত্যজিৎ রায় ও লীলা মজুমদার - তার ওপর সত্যজিৎ রায় নিজে সবার আঁকা ছবি বাছাই করেন। বিরাট ব্যাপার। আমার বেশীর ভাগ ছবিই দেখলাম মনোনীত হচ্ছে আর তার ফলে আরও বেশী করে কাজে উৎসাহ পেলাম। সত্যজিৎ রায় ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বলেছিলেন যে 'তোমার মজার স্টাইলটা তো ভালই আসে' - তাই কোনও হাসির গল্প বা ছড়ার সঙ্গে ছবি দরকার হলেই, সাধারণত আঁকার ভার পড়ত আমার ওপর।

গোড়াতেই বুঝেছিলাম যে ইলাস্ট্রেটর কে লেখার প্রয়োজনমাফিক সম্ভব, অসম্ভব, পার্থিব যে কোনও জিনিষকে আঁকার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। তার ওপর যদি ছবিটাকে মজার করে তুলতে হয় তাহলে সেই বিশেষ কায়দাটাও শিল্পীর রপ্ত কর া দরকার । একটা বাঘ চার পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে এই বাস্তব চেহারাটা আঁকা এক জিনিষ কিন্তু যদি দেখাতে হয় বাঘটা ম ানুষের মতো চেয়ারে -টেবিলে বসে মাংসের হাড় চিবোচ্ছে মুখে একটা হাসি ভাব - তাহলে শিল্পীকে খুব ভালভাবে ব াঘের অঙ্গ সংস্থান জানতে হবে - অর্থাৎ নাকটা কীরকম চওড়া - চোখটা কতটা বাঁকা - মুখটা হাঁ করলে দাঁতগুলো কীরকম বেরিয়ে থাকে-পিছনের পায়ের ভাঁজগুলো ঠিক কীরকম হয় এগুলো সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার জানা না থাকলে মুশকিল। বহু শিল্পী দেখেছি এই কারণে বাঘ আঁকতে গিয়ে শেষকালে বেড়াল এঁকে বসেন।

নিজেকে কীভাবে গড়ে তুললাম

শিল্পী হিসেবে প্রয়োজনীয় বহু পদ্ধতি সঠিকভাবে আয়ত্তে না থাকাটা প্রাথমিকভাবে আমার কাছে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিল যখন চাকরি পেলাম নামী সংবাদপত্র অফিসের শিল্প বিভাগে। আমাকে নিয়মিতভাবে পত্র - পত্রিকা ও সংবাদপত্রের পাতায় ইলাস্ট্রেশন করতে হবে। তাছাড়া আমার অভিজ্ঞতা কম - ড্রয়িং এর হাতও খুবই কাঁচা, তার ওপর যে সব পত্র - পত্রিকায় করব আগে থেকেই সেখানে সব বাঘা বাঘা শিল্পীরা কাজ করেন - এতদিন তাঁদের সব ছবি মুগ্ধ হয়ে দেখেছি এব ার তাঁদের পাশে আমার ইলাস্ট্রেশন ছাপা হবে। এসব দেখে সাংঘাতিক দুশ্চিন্তা হতে লাগল। তারপর দেখলাম কিছুটা

অজান্তেই এই সব শিল্পীদের কারও কারও প্রভাব সরাসরি আমার কাজের মধ্যে পড়তে শু করেছে। এর মধ্যে সব থেকে অ াগে নাম করতে হয় বিমল দাস আর সুধীর মৈত্রর। দুজনেই হলেন ছোটদের জন্য আদর্শ শিল্পী। ছোটদের পত্রিকা 'অ ানন্দমেলা'র তৎকালীন সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাছ থেকে একই সঙ্গে সাহস ও উৎসাহ পেয়ে এসেছি বরাবর - তিনি বোঝাতেন বাচচাদের কাগজে - বাচচাদের জন্য আঁকতে গেলে কী কী উপাদান দরকার - ফুল, পাখি, এবং কুকুর - বেড়ালের মত পোষা জীবজন্তু যে ভাবেই হোক ছবিতে রাখতেই হবে - এমনকি হিংস্র জন্তু জানোয়ারকেও কোনভাবেই খুব হিংস্র করে দেখালে চলবে না, ভূতটুত আঁকলেও তাকে দেখে যেন সবার ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। বিমল দাস দেখতাম এই রীতি হুবহু মেনে চলেছেন তাঁর ছবিতে। যেমন মিষ্টি, মিষ্টি বাচচা ছেলেমেয়ে আঁকতেন তেমনি ওস্তাদ ছিলেন জীবজন্তুর ড্রয়িংয়ে। সাদা-কালোয় ছোট ছোট আঁচড়ে এমন সুন্দর কাঠবেড়ালী এঁকেছিলেন মনে হয় নরম লোমগুলো ছোঁয়া যাবে। সবই এত ধরে ধরে যত্ন নিয়ে আঁকতেন যেন মনে হত জীবন্ত। ...এক ধরণের পারিপাট্য ছিল তাঁর সব কাজের মধ্যে— এক একটা কাজ শেষ করতেও অনেক সময় নিতেন সেটা দেখেছি। ছোটদের পত্রিকা কিংবা বইয়ের মলাট আঁকতেন রঙ দিয়ে। অসাধারণ সে সব কাজ। সুধীর মৈত্র তুলনায় অনেক দ্রুত আঁচড়ে আঁকতেন। তুলিতে মোটা করে বিভিন্ন উজ্জ্বল রং নিয়ে ঝপ ঝপ করে চাপিয়ে দিতেন। তার ওপর খুবই সুন্দর দেখতে মেয়ে আঁকতেন। আবার মজার গল্প টল্প হলে স াবলীল ভঙ্গিতে প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে একটা ক্যারিকেচার ভাব ফুটিয়ে তুলতেন।

একই সঙ্গে আরও একজনের কাজ আমি খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করতাম — তিনি হলেন সত্যজিৎ রায়। ওইরকম বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালকের হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও শুধুমাত্র 'সন্দেশ' পত্রিকার জন্যই নিয়মিতভাবে কত অজস্র ভালো ভালো ইলাস্ট্রেশন যে তিনি করে গিয়েছেন দিনের পর দিন তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। গোয়েন্দা কাহিনী, রূপকথা বা হা সির গল্প যে কোনও বিষয়ের সঙ্গেই একেবারে মানানসই ছবি আঁকার ব্যাপারে তাঁর সমগোত্রীয় আর কোনও শিল্পী অ াছেন বলে মনে করি না। সন্দেশের আগে থেকেই বইয়ের চিত্রণে তাঁর খুবই নামডাক ছিল — তাঁর বাবা সুকুমার রায়ের লেখা 'খাই-খাই', 'পাগলা দাশু' বা 'বহুরূপী' বইগুলোর ভেতরে তিনি যে সব মজার মজার ছবি এঁকেছেন সেগুলো তো এক একটা মাইলস্টোন। তুলি আর পেন দুটোতেই খুবই স্বচ্ছন্দ ছিলেন। চরিত্রগুলোর মধ্যে কমিকাল ভাব আনার জন্য অযথা খুব বেশী বিকৃত করার চেষ্টা করতেন না বরং খুব সহজ এবং সংযতভাবে ড্রয়িংয়ে ছোট ছোট মোচড় এনে সবরকম অভিব্যক্তিই ফুটিয়ে তুলতেন।

আমি ইচ্ছে করে সেই সব শিল্পীদের কাজই বেশী করে অনুসরণ করতাম যাঁরা খুব নিঁখুত ড্রয়িংটা জানতেন— তাই কে ানও কোনও ক্ষেত্রে এঁদের আঁকার পদ্ধতিগুলো দিব্যি নিজের কাজের মধ্যে লাগিয়ে দিচ্ছিলাম ফলে ধীরে ধীরে আমার ড্রয়িংয়েরও যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছিল। তবে সামগ্রিকভাবে একটা নিজস্ব স্টাইল কিছুতেই তৈরি হচ্ছিল না — সেটাই সমস্য া। এদিকে আমাকে নিয়ে সবার প্রত্যাশাও বেড়ে চলেছে। এইরকম একটা জটিল অবস্থার মধ্যে আমার কাজে একটা নতুন মোড় এনে দিল আমেরিকান একটা কার্টুন পত্রিকা যার নাম 'MAD'। এত সার্থক নামকরণ আর হতে পারে না। 'হিউম ার' জিনিসটা আদতে যে কতখানি 'অ্যাবসার্ড' হয়ে উঠতে পারে আর খাঁটি স্যাটায়ার যে মানুষের মনস্তত্ত্বকে কি ভীষণ একটা ঝাঁকুনি দিতে পারে— এই পত্রিকাটির প্রতিটি কার্টুনে তার নমুনা ছড়িয়ে আছে। যেমন বিচিত্র, যাকে বলে '.....' চিন্তাভাবনা আর বিষয়বস্তু তেমনি তাল মিলিয়ে কার্টুন আর ক্যারিকেচার এঁকেছেন শিল্পীরা।

টেলিভিশন আঁকড়ে থাকা গৃহকর্তার আলসেমি, তণ-তণীদের অবাধ মেলামেশা, ফ্যাশনসর্বস্বতা, সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা হামবড়াই ভাব, সুযোগ পেলেই অন্যকে ঠকিয়ে নেওয়ার প্রবণতা আধুনিক মার্কিন জীবনযাত্রার এই সব খারাপ দিকগুলোকে নিয়ে আগাগোড়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ভরা এই পত্রিকার প্রধান আকর্ষণ হল এর কার্টুনগুলো। ১৯৫২ সাল থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে 'MAD'। বিভিন্ন সময়ে যে সব কার্টুনিস্টরা 'MAD' এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা সব াই খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছেন - যেমন সার্জিও অ্যাবাগোনিস, ডন মার্টিন, অ্যাল জ্যাফি, মর্ট ড্রাকার, পলকোকার, - তবে এদের মধ্যে আমার সব থেকে পছন্দের শিল্পী হলেন জ্যাক ডেভিস। একটা কমিক পরিস্থিতি তৈরীর ক্ষেত্রে তিনি ড্রয়িংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় stylization আনেন চমৎকার ভাবে। অনবদ্য ডিটেলের কাজ এবং আলোছায়ার ব্যবহার সাদা কালো অথবা রঙিন সব ছবিতেই একটা বাড়তি নাটকীয়তা সৃষ্টি করে। যাকে বলে 'complete illustrator' আমার মতে জ্যাক ডেভিস হলেন তাই। ক্যারিকেচার ক্ষেত্রেও'MAD'- এর একটা বৈশিষ্টতা আছে - হলিউডের কোনও বিখ্যাত সিনেমার

প্যারডি করা হয় একটা কমিকস্ এর মতন পর পর ছবি এঁকে সমস্ত ছবিতে অভিনেতা - অভিনেত্রীদের ক্যারিকেচার থাকে।

হিউমারের এই অভিনব উপস্থাপনা সারা পৃথিবীর কার্টুনিস্টদের কাছে একটা বিরাট বড় দৃষ্টান্ত। কত শিল্পী যে জ্যাক ডেভিস আর মর্ট ড্রাকারদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন তার হিসেব নেই। 'MAD' এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে আমারও কার্টুন করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনাটাই ধীরে ধীরে পাল্টাতে শু করল। নিজেকে illustrator হিসেবে অনেক বেশী সুসংহত করতে সুবিধে হল।

কার্টুনিস্ট মানুষ হিসাবে নিজের জায়গা

একজন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে এক একরকমভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। সেই সব প্রতিক্রিয়া ধরা পড়ে তার মুখের অভিব্যক্তি এবং সেই সঙ্গে তার সারা শরীরেও। যেমন অফিসের বস্ যখন রেগে গিয়ে কেরানিকে ধমকায় তাদের দুজনের দাঁড়াবার কায়দা - হাত - পায়ের অবস্থান অর্থাৎ পুরো শরীরের ভাষাটাই হয় আলাদা। এই অভিব্যক্তিগুলোকেই একটু অতিরঞ্জিত করে তুলতে পারলেই একটা মজার ব্যাপার এসে যায়। তবে এটা যতটা সম্ভব ড্রয়িং বা অ্যানাটমি মেনে করা যায় তত বেশি সঠিকভাবে নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়। এর সঙ্গে অবশ্যই দরকার শিল্পীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা । চারপাশের লোকজন- পশু- পাখিদের বিভিন্ন আচার আচরণ সম্পর্কে সঠিক ধ্যান ধারণা এবং অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণে রসবোধ। ভালো কার্টুন করার মূল চাবিকাঠি রয়েছে এই কটি উপাদানের মধ্যেই।

কর্মজীবনের একেবারে শু থেকেই আমার আঁকার ধরণটা হিউমারের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। যদিও পরিস্থিতির প্রয়োজনে আজ অবধি আমাকে বহু সিরিয়াস বিষয়কে নিয়েও ছবি আঁকতে হয়েছে তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মজার কোনও ছবির দরকার হলে দপ্তরে আমারই আগে খোঁজ পড়ে। বিদেশে এই ধরণের রেওয়াজটাই চালু আছে। প্রায় প্রত্যেক শিল্পীই এক একটা বিশেষ শৈলীর ওপর - প্রকাশ ভঙ্গিমার ওপর বিশিষ্টতা অর্জন করেন। এর একটা সুবিধা আছে - কারণ আমি দেখেছি যে কোনও একটা বিশেষ শৈলীকে নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করলে সেই শৈলীর ওপর প্রচুর পরীক্ষা - নিরীক্ষা করা যায় আরও ঘষে মেজে দর্শক -দের কাছে আরও বেশী আর্কষণীয় করে তোলা যায়। এতে শিল্পীরই সুনাম বাড়ে। তাছাড়া যে কোনও ইলাস্ট্রেটারের বিশেষ একটা শৈলী পাঠকের কাছে কতটা গ্রহণীয় হয়ে উঠছে সেটাই তার জনপ্রিয়তার মাপকাঠি তৈরী করে। অনেকেই হয়ত নিজের অঙ্কন রীতিতে মাঝে মাঝে ওপর ওপর কিছু কিছু রদবদল ঘটান তবে সবসময়েই মূল শৈলীকে অক্ষুণ্ণ রেখেই। মনে হয় সেটাই বুদ্ধিমানেরকাজ। আমার নিজের আঁকার রূপরীতিরযে ব্যবহারিক জগতে একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে সেটা বুঝলাম যখন কাজের গন্ডিটা ক্রমশই বাড়তে লাগল। নিত্যনতুন মাধ্যমের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ এল। যে কোনও শিল্পীর কাছেই এটা একটা অ্যাডভেঞ্চারের মতো।

যে কোনও শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় সঠিক প্রকাশ মাধ্যমের। যাঁরা রাজনৈতিক কার্টুন, কিংবা ক্যরিকেচার আঁকেন তাঁদের যুক্ত থাকতে হয় খবরের কাগজের সঙ্গে আবার পুরোপুরি ইলাস্ট্রেশন বা বইয়ের মলাট আঁকেন যাঁরা প্রকাশনার জগৎটাই হয় তাঁদের প্রধান কাজের জায়গা। এছাড়াও প্রচার মাধ্যমের জন্যে শিল্পীদের নানা ধরণের চিত্রণ করার সুযোগ আছে।

আমার কাজের যে ধারা তৈরি হচ্ছিল, দেখলাম তার জন্য প্রকাশনার জগৎটাই হল উপযুক্ত জায়গা। আজ থেকে কুড়ি-বাইশ বছর আগে থেকেই আমাদের আঞ্চলিক খবরের কাগজগুলোতে রাজনৈতিক কার্টুনের গুত্ব ব্যাপকভাবে কমতে শু করেছিল। এক সময় Punch বা New Yorkes এর মতো বাংলাতেও রঙ্গ - ব্যঙ্গ নিয়ে বহু পত্র পত্রিকা নিয়মিত ছাপা হত - যাতে শিল্পীরা নানা ধরণের কার্টুন আঁকার প্রচুর সুযোগ পেতেন তবে সেগুলো কোনওটাই দীর্ঘজীবী হয়নি। দেখছিলাম আমাদের চারপাশে যাঁরা ফুলটাইম কার্টুনিস্ট তাঁরা কীরকম কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন, অনেকেই কোনওক্রমে টিকে রয়েছেন শুধু ইলাস্ট্রেশন করে। তবে পুরোদস্তুর কার্টুনকে ধীরে ধীরে বিদায় দিলেও খবরের কাগজে বিভিন্ন নিবন্ধের সঙ্গে এক ধরণের কমিক ইলাস্ট্রেশন ব্যবহারের আবশ্যিকতা বরাবরই ছিল। চাকরির শু থেকেই এই ধরণের কাজ আমাকে অনেক করতে হয়েছে। এগুলোও এক ধরণের কার্টুন বলা যায়, কারণ নিবন্ধের ক্ষেত্রে শিল্পীকে শুধু বিষয়টাই জানানো হয় এবং তার সঙ্গে কি ধরণের রূপকলা সৃষ্টি কর

া হবে তার দায়িত্ব আর স্বাধীনতা পুরোটাই শিল্পীর। দায়িত্ব এই কারণে যে ছবিটা এমনই ইঙ্গিতবহ হতে হবে যাতে প াঠকদের কাছে তার অর্থটা সহজেই পরিষ্কার হয়ে যায় - এর জন্য শিল্পী হাতি আঁকবে না ঘোড়া সে ব্যাপারে তার পুরো স্ব াধীনতা থাকে। প্রয়োজনে কোনও একটা চরিত্রের মুখে কথাও ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাতে কৌতুক আরও জমে - সব মিলিয়ে সবটাই শিল্পীর মগজের ফসল। এই ধরণের কার্টুন আঁকার সময় মাথার মধ্যে যে চিন্তা -সূত্রটা কাজ করে সেটা আমি খুবই উপভোগ করি, কেননা সেখানে ছবির ভাষা কী হবে তার জন্য লেখকের ওপর নির্ভর করতে হয় না - সৃষ্টির স্ব াধীনতা সবটাই শিল্পীর নিজের।

দেখা যাক একটা বহুজাতিক সংস্থায় ওপরতলায় বহু বড়কর্তাকে ছাঁটাই করা হচ্ছে এই বিষয়ে একটা কার্টুন করার সময় আমি কি এঁকেছিলাম। এসব ক্ষেত্রে প্রতীকী চিহ্নের ব্যবহার করলে জমে ভাল। সুতরাং দেখালাম ধূ ধূ মভূমির মধ্যে দিয়ে একটা উট চলেছে। উটটা বহুজাতিক সংস্থার প্রতীক । মভূমি অর্থাৎ বাণিজ্য জগতের বেহাল চেহারা । উটের পিঠে স্যুট ট াই পরা ব্রিফকেস হাতে কিছু লোক পড় পড় অবস্থায় অর্থাৎ চাকরি যায় যায়) এদের তুলনায় একটু বড় মাপের সেই স্যুট টাই পরা একজন উটের পিঠে গ্যাঁট হয়ে বসে যে হল ওই ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তিনি লাথি মেরে কয়েকজনকে উট থেকে ফেলে দিচ্ছেন। অর্থাৎ চাকরি খেয়ে নিচ্ছেন। সাধারণত কোন্‌টা কোন্‌ জিনিষের প্রতীক সেটা পরিষ্কার বোঝানোর জন্য চিহ্নিত করে দিলে ভালো হয়। যেমন উটের গায়ে কোম্পানীর নাম)লোকেদের ব্রিফকেসের ওপর তাদের পদের নাম) প ার্সোনাল ম্যানেজার কি চিফএক্সিকিউটিভ ইত্যাদি। ওইসব কার্টুনে সাধারণত ক্যাপশন ব্যবহার করার চল নেই।

অনেক সময় লেবেলিংয়েরও দরকার হয়না সেখানে ব্যবহার হয় চরিত্রের মুখে কিছু কথা - যেমন 'তামাক বর্জন দিবস' কে নিয়ে একটা কার্টুন করেছিলাম তাতে একজন ধুতি পাঞ্জাবী পরা সাদাসিধে মধ্যবয়স্ক লোক, হাতে খবরের কাগজ, য ারহেডলাইনে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, লেখা রয়েছে 'তামাক বর্জন দিবস' অর্থাৎ কার্টুনটা কী নিয়ে সেটা বোঝানো। পাশে একটি অতি চালাক দেখতে লোক) হাতে জ্বলন্ত সিগ্রেট - হাসি হাসি মুখ করে ধুতি পাঞ্জাবী পরা লোকটিকে বলছে - ' আমিও তামাকের বিদ্ধে, দেখছেন না জ্বালিয়ে দিচ্ছি।' লেবেলিং কিংবা সংলাপ ছাড়াও কার্টুন হতে পারে - যেমন আবুর সেই বিখ্যাত কার্টুনের কথা মনে পড়ছে - একটা বিরাট হাতির চারপাশে ছোট ছোট মাপের লাঠি হাতে কিছু অন্ধ লোক হাতির এক একটা অংশ ছুঁয়ে দেখছে । লোকগুলি আলাদা জাত ও ধর্মের এটা পোশাক আর টুপিতে বোঝানো হয়েছে আর হাতির মুখটা গান্ধীজীর মত দেখতে) অর্থাৎ সেই পরিচিত জোকটার চমৎকার উল্লেখ টানা হয়েছে। এক একজন অন্ধ লোক হাতিটার অর্থাৎ গান্ধীজীর এক একটা অংশকেই শুধু ছুঁয়ে দেখে তার ওপর ভিত্তি করে পুরো মানুষটার সম্পর্কে ধ ারণা করে উঠেছে।

যে কোনও সরস লেখার সঙ্গেই ছবি আঁকার বেশি সুযোগ থাকে - সম্পাদকেরাও পত্র - পত্রিকাতে এই ধরণের লেখার সঙ্গে প্রচুর ছবি রাখতে পছন্দ করেন।

আমি বিশেষভাবে উপভোগ করি ছোটদের জন্য হাসির ছড়া বা গল্পের সঙ্গে ছবি আঁকতে, কারণ লেখকরা সবসময়ই এগুলো একটু ক্ল্যাপস্টিকধর্মী করে তোলেন, প্রচুর উদ্ভট কান্ডকারখানা থাকে। সুতরাং ছবি আঁকবার মতো দাণ মজার মজ ার সব পরিবেশ পরিস্থিতি পাওয়া যায়। যেমন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটি ছোটদের উপন্যাসের এক জায়গায় ছিল, গ্রামের মাঠে ফুটবল খেলা চলেছে, চারিদিকে প্রচুর লোক ভীড় করে খেলা দেখছে , এর মধ্যে একটা খ্যাপা ষাঁড় হুড়মুড় করে মাঠে ঢুকে তান্ডব বাঁধিয়েছে। ম্যাগাজিনের পুরো দু -পাতা জুড়ে এমন জমজমাট ঘটনাকে রং দিয়ে আঁকার সুযোগ কমই পেয়েছি বলে মনে হয়।

একসময় বাংলা সাহিত্যে অনেকেই খুবই উৎকৃষ্ট মানের রম্যরচনা লিখেছেন। ছোট ছোট সামাজিক ঘটনা, চারপাশের অতি পরিচিত মানুষদের নিয়ে একটু হালকা মজা করা, এই হচ্ছে রম্যরচনার বিষয় । এর সঙ্গে কার্টুনের একটা বিরাট ভূমিকা থাকে - মনে আছে ' ট্রামে - বাসে' বলে রূপদর্শীর ধারাবাহিক রম্যরচনার সঙ্গে শিল্পী অহিভূষণ মালিকের আঁকা ছবিগুলো নিখুঁত সঙ্গতের কাজ করেছিল - সামান্য কয়েকটি লাইনে একটা গোটা মানুষের যাবতীয় ভাবভঙ্গি চমৎকারভ াবে ফুটিয়ে তুলতেন অহিভূষণ। ড্রয়িং এর মধ্যে কোথাও কোথাও একটা অদ্ভুত মোচড় দিয়ে মুখ বা শরীরের কোনও কে ানও জায়গাকে ভীষণ মজার করে দেখাতেন। ভালো রম্যরচনার সঙ্গে নানা ধরণের বিচিত্র মেজাজের সব চরিত্রের ছবি আঁ

াকা যায়। সেই কারণেই রম্যরচনা চিত্রণ করার মজাই আলাদা ।

দীর্ঘদিন ধরে তারাপদ রায়ের লেখা যা কিছু রম্যরচনার সংকলন বই হয়ে বেরিয়েছে - আমি তার প্রায় সব কটার সঙ্গেই ছবি আঁকার সুযোগ পেয়েছি আর পৃথিবীতে প্রায় যত রকমের চরিত্র হতে পারে, চোর, জোচ্চর, দারোগা, মাতাল, বেকার, কেরাণী, বড়কর্তা, ছোটকর্তা, জাঁদরেল গিন্নি, ধুরন্ধর দোকানদার, কিছুই আঁকতে বোধহয় বাকি রাখি নি। প্রত্যেকটি চরিত্রের বৈশিষ্টগুলো ঠিকঠিক বোঝানোর জন্য ভাবতে হয়েছে কার চুলের স্টাইল কি রকম হবে, কে কি শার্ট পরবে আর কে পাঞ্জাবী, কার চোখে চশমা দেব আর কার মুখে দাড়ি গোঁফ। আঁকার পর মনে হয় এই সব মানুষ যেন আমারই হাতে গড়া, যেমন ইচ্ছে তেমন করে সাজিয়েছি, যেন বেশ একটা মজার খেলা।
প্রতিটি শিল্পীরই মনে হয় - তিনি অনেক খেটে খুটে সৃষ্টি করেছেন তা যেন যতটা সম্ভব বেশি লোকের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। এই পৌঁছানোটা নির্ভর করে কাজটা কোথায় থাকছে, খবরের কাগজের প্রথম পাতায়, বই এর মলাটে, প্রকাশ্যে টাঙানো পোস্টারে না দেওয়ালে ম্যুরাল হিসেবে তার ওপর। কিছুটা পেশাদারী বোধ বুদ্ধি দিয়ে সব শিল্পীই এটা ঠিক বুঝে যান। আবার দেখা গিয়েছে খবরের কাগজে যেটা ছেপে বের হল তার একটা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয় ঠিকই তবে কাজটা শেষমেষ হারিয়েই যায় কারণ খবরের কাগজ কেউ দীর্ঘদিন বাড়িতে রেখে দেয় না। অন্যদিকে বইয়ে ছবি আঁকলে সেটা খুব তাড়াতাড়ি পাঁচজনের কাছে পৌঁছায় না ঠিকই তবে দেখা গিয়েছে একটা বই একজন কিনলে সেটা তার কাছে বছরের পর বছর ধরে থেকে যায় এবং দীর্ঘদিন পরেও চর্চা হয় তার ছবিগুলো নিয়ে। তার সঙ্গে বইয়ের লেখক আর প্রকাশক যদি নামী দামী হন তাহলে ছবির মর্যাদা নিঃসন্দেহে আরও বেড়ে যায়। আবার একই কাজ যদি একটা ন ইঞ্চি বাই সাত ইঞ্চি মাপের বইয়ের পাতায় না করে একটা দশ ফিট বাই পনের ফিট দেওয়ালে হয় সেটাও শিল্পীর কাছে একটা আলাদা প্রাপ্তি। এটা ভালভাবে উপলব্ধি করলাম যখন সম্প্রতি একটা অফিসের একটা গোটা দেওয়ালে জুড়ে অনেকগুলো কার্টুন দিয়ে একটা মন্তাজ মতো করতে হল। বিষয় কলকাতা শহর । আজ অবধি এটাই আমার বৃহত্তম কাজ এবং সেই কারণেই অনেকটা আত্মসন্তুষ্টির ব্যাপারও রয়েছে। তবে সব থেকে খুশি হয়েছি কলকাতার নিজস্ব জিনিষগুলোকে নিয়ে কার্টুন করতে পেরে। যেমন সেই অতি পরিচিত নন্দন চত্বর এবং সেখানে ভীড় করে থাকা আঁতেল মার্কা কিছু ছেলে মেয়ে - এদিকে দেখা যাচ্ছে বিদেশি ছবির উৎসব চলছে - ব্যানার - পোস্টারের ছড়াছড়ি - এরই মধ্যে দাড়ি, গোঁফ, গোল, গোল চশমা - কাঁধে ঝোলা একজনের মন্তব্য WHAT NO PORN?অর্থাৎ বিদেশি ছবি অথচ সেটা নেই তাই ছবি দেখার উৎসাহটাই চলে গেল। এই যে একটা লোক দেখানো সংস্কৃতিমনস্কতা বেশির ভাগ কলকাতাবাসীদের মধ্যেই দেখা যায় এটাই বোঝানো হল। অথবা মোহনবাগান - ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল ম্যাচ - মাঠের বাইরে টিকিটের পাশেই থান ইঁট বিক্রি হচ্ছে -কারণ এক দলের সমর্থক অন্য দলের দিকে ছুঁড়বে। অন্য একটা ছবিতে পার্ক স্ট্রিট পাতাল রেল স্টেশন - জিন্স আর টি-শার্ট পরা দাণ আকর্ষণীয়া এক অফিসযাত্রী তণী হাতে ব্যাগ, জলের বোতল, প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হেঁটে চলেছে আর চারপাশের বিভিন্ন বয়সের পুষ অফিসযাত্রীরা কেউ হাঁ করে, কেউ আড় চোখে অথবা ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটিকে আপাদমস্তক দেখছে - এমনকি ট্রেনের জানলা দিয়েও কেউ কেউ গলা বাড়িয়ে দিয়েছে। কলকাতার ফুটবল ম্যাচ দিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, কিংবা পার্ক-স্ট্রিট স্টেশনে সাধারণত সুন্দরী অফিসযাত্রীদের বেশী দেখা যায় এটা ঘটনা - কার্টুনিস্টের কাজ হল এই বাস্তবতার সঙ্গে নিজের কল্পনাশক্তির সাহায্যে কিছুটা অবাস্তবতা মিশিয়ে গোটা জিনিষটাকে নাটকীয় করে তোলা। সেই কারণেই দেখাতে হয় ইঁট বিক্রি হচ্ছে কিংবা সব যাত্রীরাই হ্যাংলা চোখে তাকাচ্ছে। মনে আছে আর কে লক্ষ্মণ পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে একটা কার্টুন করেছিলেন তাতে ছিল একটা লোক ব্যাগ আর ফাইল সমেত শহরের রাস্তা দিয়ে হাতির পিঠে চড়ে অফিস যাচ্ছে - পাশের এক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা গাড়ির চালককে কাঁচু মাঁচু মুখ করে বলছে 'কি করব, গাড়ি চড়ার থেকে আজকাল এটাতেই সস্তা হয়।' এই হাতির ভাবনাটা আসলে অবাস্তব হলেও কার্টুনে ওটাই কৌতুক সৃষ্টি করায় সাহায্য করছে সব থেকে বেশি। আমার নিজের এখন খুবই ইচ্ছে করে বিভিন্ন জায়গা ও তার মানুষদের জীবনযাত্রা নিয়ে কার্টুন সিরিজ করতে - শুটা অবশ্যই কলকাতা থেকে হবে। তবে এর জন্য যে ধরণের সিরিজ মারিও বহু করেছেন গোয়া,বম্বে অথবা জার্মানির বিভিন্ন শহরের ওপর। দিল্লি শহরের ওপর করেছেন আরও একজন কার্টুনিস্ট তাঁর নাম সুধীর দার।

পেশাদার শিল্পীর সার্থকতা

আমি মনে করি পেশাদার কার্টুনিস্টরা আসলে একজন ভালো বিনোদকের ভূমিকা পালন করেন। যে ছবিই আঁকি না কেনসেটা কাদের জন্য আঁকছি, কারা দেখবে এবং সর্বোপরি তারা কী চায় এ ব্যাপারে চিরকাল চিন্তা ভাবনা করেছি। সবসময়ে মনে হয়এদের যথার্থ মনোরঞ্জন করতে পারলে তবেই আমার সৃষ্টির সার্থকতা। এ ব্যাপারে যত বেশি উৎসাহ ব া প্রতিত্রিয়া পাওয়া যায় ততসুবিধে হয় একটা সঠিক পথের নির্দেশ পেতে। সবসময় খেয়াল রেখেছি আমার কোন্ ছবিতে কী কী উপাদান, কী ধরণের ভঙ্গি ব্যবহার করলে লোকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। এই পাঠক বা দর্শকদের সঙ্গে ছবির মাধ্যমে যে একটা অদৃশ্য যোগসূত্র প্রতিমুহূর্তে তৈরি হচ্ছে এই ব্যাপারটা খুব মজার। আবার কত মানুষ আছে য াদের চিনিনা, জানিনা, তারা আমার ছবি নিয়মিত দেখেন, শিল্পী হিসেবে তাঁদের কাছে আমার একটা অস্তিত্ব রয়েছে - এটা যখন ভ াবি অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়। তাই হাতে তুলিটা নিয়ে ছবি আঁকতে বসে এদের কথা মাথায় থাকে। বলা যায় অ ামার ছবির অনুরাগীরাই আমার ছবিকে আড়াল থেকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই এদের কথা ভেবেই নানা আইডিয়া মাথায় চলে আসে। মুহূর্তের মধ্যে এঁকে ফেলি ডোরাকাটা জামা গায়ে একটা বিচ্ছু ছেলে, কোট-প্যান্ট পরা লোক বিকট চিৎক ার করছে তার সামনে টেবিলে - উল্টোদিকের চেয়ারে একটা হাবাগোবা গোছের লোক - এমনকি দেয়ালে ছবি-ঘড়ি কী কী থাকতে পারে, টেবিলের ওপর জলের গ্লাস, পেন-দানি, ফাইলপত্র, বলতে গেলে প্রায় মুখস্থের মতো হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ া, এ ছাড়া ছবির মধ্যে যে কোনও ভাবেই হোক একটা বেড়াল থাকা চাই। একেবারে গোড়ায় যখন ছবি করার সময় কী কী মজার উপাদান ছবিতে রাখা যায় এ নিয়ে ভাবতাম তখন মনে হয়েছিল বেড়াল বা কুকুরজাতীয় পোষা জীবজন্তুকে filler হিসেবে ব্যবহার করলে ছবিটা জমে ভালো - বিশেষ করে ছোটদের ছবিতে সুযোগ পেলেই গাছের ডালে কাঠবেড় ালী, ঝুলন্ত বাঁদর, কচ্ছপ, খরগোস এই সব একধার থেকে এঁকে গেছি। তবে অতিমাত্রায় বেড়াল-প্রীতির জন্যই বোধহয় দেখা গেল আমার প্রায় সব ছবির কোনও না কোনও জায়গা থেকে অন্তত একটা বেড়াল উঁকি মারছে। যারা আমার ছবির খোঁজ খবর রাখেন তাঁদের এটা নজর এড়ায়নি-তাঁদের কাছেই জানলাম যে আমার ছবি মানেই নাকি বেড়াল। অর্থ াৎ বেড়ালকে সব ছবিতেই রাখতে হবে। এই ভাবেই শিল্পী হিসেবে আমার নিজস্ব একটা ICON তৈরি হয়ে গেল।
সাধারণত আমি ছোটদের জন্যই বেশি ছবি আঁকি । আমার সব সময়েই মনে হয় আমি ছোটদের মনের সঙ্গে খুব সহজেই যোগাযোগ করতে পারি। কী ধরণের ছবি দেখলে ওদের ভালো লাগবে সেটা অনুভব করার জন্য আমার নিজের ছে াটবেলায় ফিরে যাই, যে বয়সে সুকুমার রায় বা শৈল চত্রবর্তীর আঁকা আমার সমস্ত কল্পনা জগৎকে দখল করে রেখেছিল - চেষ্টা করি চল্লিশ বছর আগের সেই ভাললাগাটাকে আজকের ছোটদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে আমার আঁকার ভিতর দিয়ে। জানিনা আমার ছবিতে এমন কোনও চিরকালীন আবেদন আছে কিনা তবু আমি যেন সেই দীর্ঘ পরম্পরার এক ছে াট অংশবিশেষ যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নানা রূপকল্প সৃষ্টি করে মানুষকে কিছুটা আনন্দের সন্ধান দিয়ে চলেছে।

সংযোজন

এই লেখার অনুষঙ্গে দেশী বিদেশী যেসব প্রধান কার্টুনিস্টদের বা ইলাস্ট্রেটরদের কথা এসেছে পাঠকদের জন্য তাঁদের (বর্ণানুত্রমিকভাবে) সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

অমল চত্রবর্ত্তী

জন্ম ১৯৩৬ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। স্কুল থেকেই কার্টুন আঁকার ঝোঁক। প্রেরণা শৈল চত্রবর্তী কাফি খাঁ এবং পরবর্তীকালে ডেভিড লো। প্রথম জীবনে রেলে চাকরি ছেড়ে কার্টু নকে পুরোপুরি জীবিকা হিসাবে গ্রহণ। 'সচিত্র ভ ারত' 'অচল পত্র', 'শংকরস্ উইকলি'তে নিয়মিত তাঁর কার্টুন ছাপা হয়েছে ৫০ এর দশকে। ৬০ এর দশকের শুতে অ

ানন্দবাজারে ‘তির্যক’ নামের দৈনিক পকেট কার্টুন ও রাজনৈতিক কার্টুন এঁকেছেন - পরে‘অমৃতবাজার পত্রিকা’তে পাকাপা কিভাব যোগ দেন। দীর্ঘদিন কার্টুন এঁকেছেন ‘যুগান্তর’ কাগজেও) পরে ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে ‘সংবাদ প্রতিদিন’-য়ের নিয়মিত কার্টুনিস্ট।

অহিভূষণ মালিক

জন্ম ১৯২৫ সালে কাশীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে, কিন্তু অনাথ হয়েছিলেন শৈশবেই। অতঃপর শু থেকে সংগ্রাম - বড় হওয়ার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার। ছিলেন বিজ্ঞানের স্নাতক পরে জীবনে ঘটে যায় নানা ওলট পালট। ছবি আঁকা শু করলেন, পরে সেটাই হল জীবিকা। চল্লিশের দশক থেকে ছিলেন কলকাতায়। বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে কার্টুন আঁকছেন, স্কেচ করছেন - পরে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ -তে হল পাকা চাকরি। এই সময় কলকাতার বহু শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে ছিলেন। আর্ট সম্বন্ধে বিস্তর পড়াশুনো চালিয়ে গিয়েছেন সারাজীবন। চিত্র সমালোচক হিসেবেও তাঁর বেশ নাম হয়েছিল। ইংরাজি ও বাংলা দুটো ভাষাতেই সমান দখল ছিল। অবসর নেওয়ার ঠিক পরেই ১৯৮৬তে মাত্র একষট্টি বছর বয়সে তাঁর অকাল প্রয়াণ ঘটে।

আর.কে.লক্ষণ

জন্ম ১৯২৭ এ বাঙ্গালোর শহরে। পারিবারিক সূত্রে সাহিত্যিক আর.কে. নারায়ণের ছোট ভাই। ছোট বেলা থেকেই গভীর শিল্পমনস্কতা তৈরী হয়। সেই সঙ্গে আঁকা আঁকিও শু। বহু ইচ্ছে থাকলেও আর্ট কলেজে পড়ার সুযোগ পাননি, হয়েছিলেন ইতিহাসের স্নাতক - তবে পেশাদার কার্টুনিস্ট হবার স্বপ্ন দেখেছেন ছোট থেকেই। তাই পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে প্রথম দিল্লি তারপর ঘটনাচক্রে বোম্বাই এ আসা। কিছুদিন এদিক ওদিক কাজ করার পর কার্টুনিস্ট হিসেবে যোগ দিলেন‘টাইমস্ অব ইন্ডিয়া’-তে। ১৯৪৭ সালে শু হল পকেট কার্টুন‘YOU SAID IT’ আজও যা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। পাঠকদের বিচারে সর্বভারতীয় কার্টুনিস্ট হিসেবে সব থেকে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

কুট্টি

জন্ম কেরলের ওট্টাপালামে ১৯২২ সালে। কার্টুন আঁকা শু করেন মালয়ালি কাগজে। তারপর দিল্লির ‘শঙ্করস্ উইকিল’র সঙ্গে যুক্ত হন গোড়া থেকেই। পরে কিছুদিন দিল্লির ‘হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ডে’ কাজ করার পর পাকাপাকি ভাবে র াজনৈতিক কার্টুনিস্ট হিসেবে যোগ দেন ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’তে পঞ্চাশের দশকে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে নিয়মিত কার্টুন এঁকে গিয়েছেন ওই কাগজে এবং সেই সূত্রে বাঙালি পাঠকের কাছে তিনি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন। আশির দশকের গোড়ায় ‘আনন্দবাজার’ ছেড়ে ‘আজকাল’-এ কিছুদিন কার্টুন করেন। এখন সম্পূর্ণ অবসর জীবন যাপন করছেন মেয়ের কাছে সুদূর কানাডায়।

জর্জ রোমি (হার্জ)

জন্ম ১৯০৭ সালে ব্রাসেলস্-এ। ছোট থেকেই ছবি আঁকার নেশা। ঘন্টার পর ঘন্টা একমনে এঁকে যেতে পারতেন। নিজে নিজেই ছবি আঁকা শিখতেন। গোড়ায় ‘টিউটর’ নামের একটি ছেলেকে নিয়ে কমিক্স করেন, সে ছিল একটি স্কাউট নেতা - পরে তাকেই আরও পরিবর্তিত করে সৃষ্টি হয় ‘টিনটিন’ যে মূলত একজন সাংবাদিক। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয় টিনটিনের প্রথম কমিক্স ‘টিনটিন ইন দ্য ল্যান্ড অফ সোভিয়েত’। তারপর টিনটিনকে নিয়ে বের হতে থাকে একের পর এক বই - ক্রমে সারা পৃথিবীতে এর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কম বেশি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশটি ভাষায় অনুবাদ হয় টিনটিন কমিক্স। টিনটিন ছাড়াও আরও নানা ধরণের কমিক্স বানিয়েছেন হার্জ। ছোটদের পত্রিকাও বার করেছেন এক সময়। ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে হার্জ-এর

জ্যাক ডেভিস

জন্ম ১৯২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায়। এথেন্সের জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেছেন। ১৯৪৫-এ পেশাগতভাবে কার্টুনিস্টের জীবন শু। ১৯৫২-তে 'MAD' পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া, বিজ্ঞাপনের জন্যও প্রচুর এঁকেছেন। ওয়াল্ট ডিজনির ছবির ভক্ত বরাবরই। নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর সমস্ত কাজে রয়েছে কার্টুন ফিল্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব। ২০০১ সালে ন্যাশনাল কার্টুনিস্ট সোসাইটির তরফ থেকে তাঁকে 'ব্রেন এ্যাওয়ার্ড' দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

ডব্লিউ হিথ রবিনসন

জন্ম ১৮৭২ সালে লন্ডনের হর্নসী রাইজ নামে একটি গ্রামে। ঠাকুর্দা ও বাবা দুজনেই ছিলেন দক্ষ এনগ্রেভার ও চিত্রকর। তাই স্কুল শেষ করে প্রথমে রয়েল এ্যাকাডেমিতে এবং কিছুদিন পরে চলে এলেন লন্ডনে বাবার স্টুডিওতে। সেখানেই ১৮৯৭ থেকে বইয়ের ইলাস্ট্রেটর হিসেবে সাফল্যের শু। সেই সঙ্গে ছোটদের জন্য লিখতেও আরম্ভ করলেন। তাঁর লেখা ও ছবি নিয়ে প্রকাশিত হল 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স্ অফ আঙ্কল লুবিন' (১৯০২) ও 'বিল দ্য মাইন্ডার (১৯১২)! বরাবর ছোটদের জন্য মজার ছবি আঁকতে পছন্দ করতেন। হিউমার জিনিসটা ছিল তাঁর পরিবারেই। ১৯২০ থেকেই নিয়মিত কার্টুন আকাঁ শু করেন। মানুষের তৈরি আজগুবি ও কাল্পনিক যন্ত্রপাতি আঁকায় তাঁর জুড়ি ছিল না। এ সব নিয়ে নানান সময়ে অজস্র কার্টুন এঁকেছেন। 'অ্যাব্সারডিটিজ্' নামের একটি বিখ্যাত সংকলন আছে এসব কার্টুনের। এরপর ১৯৪৫ সালে বোরোয় 'রেলওয়ে রিবল্ডি' যা সন্দেশ পত্রিকাতে 'রেলগাড়ির আদিপর্ব' নামে বেরোয়। ১৯৪৪ সালে রবিনসন প্রয়াত হন।

ডেভিড লো

১৮৯১ সালে নিউজিল্যান্ডে জন্ম। সে দেশের 'স্পেক্টেটর' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কার্টুন বের হয়। চলে আসেন অষ্ট্রেলিয়ার সিডনি বুলেটিনে। ১৯১৯ সালে ব্রিটেনে 'স্টার', 'দ্য ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড' 'ডেলি হেরালন্ড' এবং অবশেষে 'গার্ডিয়ান'-এ যোগ দেন। নিজের জীবদ্দশাতেই ডেভিড লো কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। দেশ-বিদেশের শত শত পত্রিকায় তাঁর কার্টুন পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ১৯১৯ থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সময় ইউরোপের ইতিহাস, রাজনৈতিক ঘটনাবলী সন তারিখ সহ লিপিবদ্ধ করে, কার্টুনসহ প্রকাশ করেছেন। ১৯৬৪-র সেপ্টেম্বরে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সক্রিয় ছিলেন।

বিমল দাস

জন্ম ১৯৩৫ সালে কলকাতায়। স্কুলে পড়তে পড়তেই ছবি আঁকার শু। খুব অল্প বয়েস থেকেই আঁকাকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন। পুরোপুরি স্বশিক্ষিত শিল্পী — কাজ করতে করতেই সব কিছু আয়ত্ত করেছেন। প্রথম জীবনে রোজগারের খাতিরে নানা ধরণের কাজ করতে হয়েছে — ..... অথবা .....। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৮ ন্যাশনাল টোবাকোতে চাকরি করেছেন ডিজাইনার হিসেবে। পুরোদস্তুর ইলাস্ট্রেটর রূপে এই রকম সময় থেকেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৯৭৯ থেকে 'আনন্দবাজার'-এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন শিল্পী হিসেবে। মূলত ছোটদের জন্যই আঁকেন। একটানা বহু বছর ছোটদের পত্রিকা 'আনন্দমেলা'র সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে শৈল চক্রবর্তীর পর ছোটদের লেখার সঙ্গে অলংকরণে তিনিই নিঃসন্দেহে সফলতম শিল্পী। বর্তমানে আংশিক অবসর জীবন যাপন করছেন।

মারিও মারিন্দা

জন্মসুত্রে গোয়ানিজ। পড়াশুনা গোয়ার সেন্ট যোসেফ স্কুলে, পরে মুম্বাই এর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইংরাজির স্ন

াতক। প্রথাগতভাবে ছবি আঁকা শেখেননি তবে কলেজে পড়তে পড়তেই কার্টুনিস্ট হিসেবে ফ্রি-লান্স কাজ শু করেন এবং পরে যোগ দেন 'টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়া' গ্রুপ অব পাবলিকেশন-এ। ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে ষাট-এর দশক থেকেই বহু দেশে গিয়ে স্কেচ করে বেরিয়েছেন। সেই সব স্কেচ প্রদর্শিত হয়েছে দেশের নানা জায়গায়। পরে বিভিন্ন বই হয়েও বেরিয়েছে। এ ছাড়া ছোটদের বইয়েও তিনি বহু ইলাস্ট্রেশন করেছেন। চাকরি ছেড়ে এখন তিনি সম্পূর্ণভাবে ফ্রিলান্সার হিসেবে কার্টুন এঁকে চলেছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে।

শৈল চক্রবর্তী

জন্ম ১৯০৯ সালে মৌরিগ্রামে। ১৯২৮ সালে কলকাতায় সিটি কলেজ থেকে বিজ্ঞানের স্নাতক। ১৯৩৫ থেকে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস। সম্পূর্ণ ফ্রি-লান্সার হিসেবে সাময়িক পত্রপত্রিকাতে ছবি ও কার্টুন এঁকে গিয়েছেন সারাজীবন। ছে াটদের মজার গল্প লেখা ও অলংকরণেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। লেখক হিসেবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন একাধিকবার। শেষ জীবনে পুরোপুরি ছবি আঁকায় মন দিয়েছিলেন। প্রদর্শনীও করেছেন দেশে-বিদেশে বহু জায়গায়। ১৯৮৯-এ কলকাত ায় তাঁর প্রয়াণ ঘটেছে।

সত্যজিৎ রায়

জন্ম ১৯২১ সালে কলকাতায়। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতির স্নাতক হয়ে মার ইচ্ছে মতন ১৯৪০-এ শা ন্তিনিকেতন কলাভবনে ছবি আঁকা শিখতে যান। শিক্ষা সম্পূর্ণ না করেই কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৯৪৩-এ কর্মাশিয় াল আর্টিস্ট হিসেবে নামী বিজ্ঞাপন সংস্থায় যোগ দেন। ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়েন বই-এর মলাট ও ছবি আঁকার সঙ্গে। ১৯৫৫ সালে তৈরী করেন তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'পথের পাচাঁলী' যা তাঁকে এনে দেয় ঝিজোড়া খ্যাতি। বিজ্ঞাপন সংস্থার ক াজ ছেড়ে এরপর পুরোপুরি সিনেমা তৈরীতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬১ সাল থেকে ঠার্কুদা উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিষ্ঠিত বন্ধ হয়ে যাওয়া ছোটদের জন্য সাহিত্য রচনার শু এবং বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন। অবিস্মরণীয় বহু সিনেমা করার পাশাপা শি বাঙলা সাহিত্যে সৃষ্টি করেছেন ফেলুদা, প্রফেসর শঙ্কু কিংবা তারিণীখুড়ে ার মতো অসাধারণ সব চরিত্র। সেই সঙ্গে অক্লান্ত ভাবে প্রচ্ছদ এবং অলংকরণ করে গিয়েছেন 'সন্দেশ' ও আরও নানা পত্র পত্রিকার জন্য, যা শিল্পজগতে মোড় ঘে ারানো কাজ হিসেবে চিহিত হয়ে আছে। ১৯৯২-র এপ্রিলে কলকাতায় সত্যজিৎ রায়ের জীবনাবসান ঘটে।

সুধীর দার

জন্ম ১৯৩২ সালে এলাহাবাদে। ভূগোলে, এম. এ পাশ করে প্রথম বেতার পরে এয়ার ইন্ডিয়ার সেলস্‌ বিভাগের কাজ করেছেন। ১৯৬০ সাল থেকে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকাতে ..... নাম দিয়ে কার্টুনের সিরিজ শু করেন। ১৯৬৭ থেকে 'হিন্দুস্থান টাইমস্‌'-এ নতুন সিরিজ '.....' এবং পাশাপাশি রাজনৈতিক কার্টুন। সারা পৃথিবীর বহু নামী কাগজে তঁ ার কার্টুন ছাপা হয়েছে এবং দেশ বিদেশের একাধিক পুরস্কার তিনি সম্মানিত।

সুধীর মৈত্র

জন্ম ১৯৩১ কলকাতা। আদি বাসস্থান টাঙ্গাইল। টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাত ার ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ থেকে স্নাতক হন ১৯৫০-এ। এই কলেজে অধ্যাপনাও করেন বেশ কিছুদিন। ১৯৬৩-তে 'স্টেটস্‌ম্যান'-এর আর্ট এ্যান্ড পাবলিসিটি বিভাগে যোগ দেন— তারপর ১৯৯১-তে ঐ বিভাগের প্রধান হিসেবে অবসর নেন। আর্ট কলেজ থেকে পাশ করার পরেই পত্রপত্রিকার অলংকরণের প্রতি বিশেষ আর্কষণ। পরে পুরোপুরি ইলাস্ট্রেশন

করাতে নিযুক্ত করেন নিজেকে। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে এই কাজই করছেন অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভাবে। এরই সঙ্গে জল রং, তেল রং, স্কেচ ইত্যাদিতেও সমান উৎসাহ। ৭০-এর দশক পর্যন্ত তাঁর ছবির নিয়মিত প্রদর্শনীও হয়েছে। সময় সুযোগ পেলে প্রবন্ধও ছড়াও লিখে থাকেন।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com